মহারাজার তবলা

ভূদেব ভকত

ডিন ঃ

রঁদা, বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর। কেউ কেউ উচ্চারণ করেন ডিন। রঁদার বিখ্যাত একটি ভাস্কর্য, থিংকার। নিখিল একটু ঝুঁকে বাম উতে ডান হাতের কনুই রেখে, হাতের মুঠো চিবুকে ছুঁইয়ে হুবহু একেবারে থিংকারের মতোই বসল। কোমরে কেবল ছোট্ট বস্ত্র একখানি। সুঠাম কালো চেহারা নিখিলের। উড়িষ্যার ছেলে। আর্ট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে আর্ট কলেজে গো এজ ইউ লাইক এর প্রতিযোগিতা হবে। আমরা ঠিক করলাম, উদ্ভট কিছু একটা করে দেখাতে হবে। থিংকারের ভঙ্গিতে ওভাবে বসতে প্রথমে কেউই রাজী হলো না। কারণ, যে বসবে, তাকে মাটি দিয়ে ঢেকে ফেলা হবে। উড়িষ্যার নিখিল শেষমেষ রাজী হলো। ভাস্কর্য ক্লাসের চাকা লাগানোটুলটার ওপর নিখিল বসল। আমরা পটাপট নিখিলকে আপাদমস্তক মাটি দিয়ে ঢেকে ফেললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেইনিখিল রঁদার থিংকারে পরিণত হলো। কলেজের প্রাঙ্গনে ওদিকে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চাকা লাগানো টুলখানা ঠেলতে ঠেলতে আমরা হাজির হলাম প্রতিযোগিতার মাঠে। সকলেই হতবাক্। বিচারক দলের মুখেওকথা নেই। একি ব্যাপার, মাটির একটি মূর্তি প্রতিযোগিতায় কেন ! একটু পরেই বিচারকেরা বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা মাটির ভেতরে এদিকে নিখিল বেচারা ঠান্ডাতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মুর্তিটাও মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। অন্যরা কেউ সেজেছে জাপানী, কেউ পাঞ্জাবী, কেউ ফুচকাওয়ালা, কেউ পর্যটক। একটু পরেই প্রথম পুরস্কারের ঘোষণা হলো। আমাদের থিংকারই পেয়েছে প্রথম পুরস্কার। কানের কাছে মুখ নিয়ে নিখিলকে সুখবরটা দিলাম। আনন্দ চাপতে না পেরে নিখিল দুপাশে দুহাত ছড়িয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল। নিখিলের তখন খেয়াল নেই। ওর পরনে তখনএক চিলতে নেংটি ছাড়া আর কিছুই নেই। মাটিমাখা শরীর নিয়ে প্রায় উলঙ্গ নিখিল শু করল দৌড়। দৌড়তে কলেজের পেছনের দিকের পুকুরে ঝাঁপ।

অঙ্কুমহারাজ ঃ

নামটা আমিই দিয়েছিলাম ওকে। ওর আসল নামটা যে কি ছিল, আজ আর মনে পড়ে না। আসল নামটাহারিয়ে গিয়েছে। মানুষটা কিন্তু হারায়নি। পৃথিবীর নিয়মিত সমস্যা যতই থাকুক, স্মৃতি মানুষের পিছু ছাড়ে না। কিছু স্মৃতি হারিয়ে যায়। রং হারিয়ে কিছু স্মৃতি সাদাকালো হয়ে বেঁচে থাকে মনের কোণে। কারো কারো চেহারা সঠিকমনে পড়ে না। বিমূর্ত হয়ে থেকে যায় মস্তিস্কে। চুনীদা, মধুদা, সত্যেনদা, হিরণদা, নৃপেন, মৃণাল, জ্যোতির্ময়, অশোক, স্বপন, সনৎ, বাণী, মঞ্জুলা, জনা, ভারতী এদের কিছু কিছু চেহারা মনে পড়ে, আবার মনে পড়েও না। অঙ্কুরের আসল নামটাই তো মনে পড়ে না। কিছু সাদাকালো স্মৃতি জৌলুস হারাতে হারাতে ধূসর হয়ে যায়। কিছু কিছু মানুষনতুন ভাবে রঙিন হয়ে ফিরে ফিরে আসে। হঠাৎ দেখা হয়ে যায় কারো কারো সাথে জীবন - চলার পথে। এই স্মৃতিনিয়েই মানুষের ছবি, গান, কবিতা, সাহিত্য আর কাহিনী।

অঙ্কু একা একাই থাকতে ভালোবাসতো। ক্যান্টিনে বসে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে মাঝে মাঝে সে পালুস্করের গান গুনগুন করে গাইতো। বেশ একটা খানদানী আমেজ ছিল অঙ্কুর গলায়। ঐ গানের টানেই অঙ্কুর সাথে আমার আলাপ। পরে জ

ানলাম, অঙ্কু ভালো নাচতেও পারে। ধীরে ধীরে আমাদের সঙ্গে ওর হৃদ্যতা জমে উঠলো। আমাদের একটা ছোট দল গড়ে উঠেছিল আপনা আপনিই। ছুটির দিনগুলোতে সকলে মিলে কখনো গঙ্গার পাড়ে, কোনোদিন যাদুঘরের ভেতরে, কখনো নিউ মার্কেটের মধ্যে, কখনো হাওড়া স্টেশনের চত্বরে, আবার কখনো বা ময়দানেআমরা ছবি আঁকার অভ্যাস করে বেড়াতাম। অঙ্কুও আমাদের ঐ দলে থাকতো।

একদিন আবিষ্কার করে ফেললাম, অঙ্কু বিগত দিনের বিখ্যাত তবলিয়া কণ্ঠে মহারাজের প্রপৌত্র। এবং স্বনামধন্য কত্থক নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজের কাছে নাচ শেখে। এই আবিষ্কারের পরেই ওর নাম দেওয়া হয়েছিল অঙ্কুমহারাজ। আশ্চর্য? ঐ নামটাই স্মৃতির কোঠায় রয়ে গেছে। আসল নামটা যে কি ছিল, অনেক ভেবেও মনে করতেপারি না।

শুনেছি কণ্ঠে মহারাজের না, ধি, ধি, না শুনে শ্রোতাদের নাকি তাক লেগে যেতো। পুরনো দিনের সঙ্গীত রসিকেরা বলতেন, তবলাতে ওরকম মুক্তোর দানার মতোন পরিষ্কার বোল নাকি আগে শোনা যায়নি। মনে মনে ভাবিনা জানি কি যাদু ছিল কণ্ঠে মহারাজের আঙুলে !

অঙ্কু ছিল বেশ চাপা ছেলে, তাই অনেক সময় লেগেছিল পেছনের পাতা ওল্টাতে, ওর সঙ্গীত ঘরানার ইতিহাস আবিষ্কার করতে। আমরা একদিন মহাজাতি সদনে দেখলাম কণ্ঠে মহারাজকে তাঁরই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। প্রায় নববই ছুঁই ছুঁই তখন তাঁর বয়েস। পুত্র নান্কু মহারাজ এবং পরমাত্মীয় কিষাণ মহারাজ ও বিরজু মহারাজের হাত ধরে সেদিন তিনি উঠে এসেছিলেন মঞ্চে। অনেক অনুনয়ে অঙ্কুকে রাজী করিয়ে একদিন অঙ্কুর সাথে পৌঁছে গেলাম কণ্ঠে মহারাজের বাড়িতে। প্রথমে অবশ্য তেমন পাত্তা পাইনি। বেশ কয়েকবার যাতায়াতের পর বৃদ্ধ কণ্ঠে মহারাজের আমাকে ভালো লাগতে আরম্ভ করল। বিশেষ করে যখন উনি জানলেন যে আমিও তবলার ভক্ত। একদিন বলে বসলাম, আমি আপনার কাছে তবলা শিখব। আপনার হাতে শুনেছি যাদু আছে। যদিও জানি আজকাল উনি বাজাতেপারেন না, তবু আমার কথায় বৃদ্ধের আঙুলগুলো একটু যেন নড়ে উঠলো। নীল নীল শিরা উপশিরাগুলোর মধ্যে এককালের তাক লাগানো ব্যাপারটা খোঁজার চেষ্টা করলাম। বাড়িতে জোড়ায় জোড়ায় তবলা বাঁয়ার ছড়াছড়ি। একজোড়া টেনে নিয়ে বললেন দেখি বাজাও! ভয়ে ভয়ে বাজালাম যতটুকু জানি। হারানো কালের দিকপাল একজন তবলিয়ার পায়ের কাছে বসে বাজানোটাও পরম সৌভাগ্যের। বাজনা শুনে খুশি হয়ে জানতে চাইলেন, কার কাছে শিখেছি। বললাম জামশেদপুরে বাড়ি আমার। সেখানে আমার গু ছিলেন শ্রীকেশব চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর উনি বললেন, শোন, টালিগঞ্জে যাবে, সিদ্ধেরবাবুর বাড়ি খুঁজে বার করবে। সিদ্ধের মুখোপাধ্যায়, সকলেই চেনে, সিদ্ধেরবাবুর বাড়ির চার পাঁচখানা বাড়ি ছেড়ে ফণিবাবু থাকেন, ফণি সিনহা, খাঁ সাহেবের সাগরেদ, কেরামত খাঁ, ফণিবাবুর কাছে যাবে, আমার নাম বলবে, যাও আরম্ভ কর তালিম। তারপর উনি তাঁর পুরনো দিনের সংগ্রহ থেকে খয়ের কাঠের প্রকাণ্ড একখানা তবলা আমায় উপহার দিয়ে বসলেন। ঐ মহামূল্য উপহার বগলে করে মহানন্দে আমি সেদিন হস্টেলে ফিরে এলাম।

গ্রামোফোন ঃ

পরবাসী ছাত্রদের জন্য প্রথম দিকে আর্টকলেজের কোনো হস্টেল ছিল না। সব কলেজেই দু-এক জন নেতা থাকে। ঐ রকম এক নেতার দুঃসাহসিক উদ্যোগে কলেজ ক্যান্টিনের ডাইনিং হলের ওপরতলার হলঘরটা দখল করে আমরা আরম্ভ করেছিলাম। প্রায় একশো বছরের পুরনো আমাদের কলেজ। মাঝখানের বাগানে বিশাল বিশালনিম, শিমূল, অশত্থগাছ। ছায়া ঘন ভয় ভয় পরিবেশ। এখানে ওখানে ছাত্রদের তৈরি নানা মূর্ত বিমূর্ত ভাস্কর্য ছড়ানো। ঐ মায়াময় ছায়া পেরিয়ে আমাদের হস্টেল, অর্থাৎ ক্যান্টিন। সন্ধের পর গা ছমছম করতো ঐ ছায়া পেরিয়ে হস্টেলে যেতে। বৃদ্ধ দয়ারাম দারোয়ান নাকি গভীর রাতে বেশ কয়েকবার সাহেব ভূতেরও দেখা পেয়েছে। আমরাও মাঝরাতে কখনো শুনতাম ঠুকঠাক নানা আওয়াজ। পাশেই যাদুঘর। মমি টমিরা হাঁটা চলা করতো কি না কে জানে! বেশিদিন অবশ্য আমাদের থাকা হলো না চৌরঙ্গীর মতন জায়গায়। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের হটানোর নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। শু হলো হরতাল, ঘেরাও, ভাঙচুর। অবশেষে অনশন ইত্যাদির পর তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ও রামকৃষ্ণমিশনের বদান্যতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলে যদুলাল মল্লিক রোডের ওপর একটি চারতলা বাড়ির তিনতলায় এবং চারতলায় হলো আমাদের স্থায়ী হস্টেল। আমার ঘরটি ছিল চারতলায় কোণের দিকে। একটি টানারিক্সাতে বাক্স, বিছানা, ইজেল - ক্যানভাস এবং মহারাজার তবলা বোঝাই করে

চৌরঙ্গী থেকে সেদিন পৌঁছেছিলাম জোড়াসাঁকোর হস্টেলে। রিক্সাভাড়া তিনটাকা। সালটা ছিল উনিশশো তেষট্টি।
আজকাল যেমন একটা জিনিষ কিনলে আর একটা জিনিস ফ্রিতে পাওয়া যায়, আমরা ঐ হস্টেলবাড়িটির একটি ঘরে পেয়েছিলাম একটি পরিত্যক্ত গ্রামোফোন। কিছু মর্চেপড়া পিন আর কয়েকটা রেকর্ডও পড়েছিল। রেকর্ডগুলো প্রায় সব কটিই ভাঙা। একটিই কেবল আস্ত ছিল। পাহাড়ী সান্যালের গাওয়া শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালানিশিদিন শ্রীকৃষ্ণ নাম মে ার ধ্যান। মেগাফোন কোম্পানি ১৯৩৮ সালে বার করেছিল রেকর্ডটা। আর এক পিঠে কি গান ছিল আজ আর মনে নেই। কেন গ্রামোফোনটা ফেলে চলে গিয়েছিল, বোঝা গেল, দম দিয়ে ওটা চালাতে গিয়ে।বাজাতে গিয়ে দেখা গেল গান বার হচ্ছে খুবই মোটা গলায়। এ কার গলা? এতো পাহাড়ী সান্যাল নয়! একটু পরে দেখা গেল রেকর্ডের স্পিড বেড়ে চলেছে এবং একসময় পাহাড়ীবাবুর গলা চেনা গেল। কিন্তু রেকর্ডের স্পিড বেড়েই চলেছে ক্রমাগত। বাড়তে বাড়তে শেষের দিকে গান শেষ হলো কিচির মিচির পাখির ডাকে। ফ্রিতে পাওয়া গ্রামোফোন। ফেলেও দেওয়া যায় না। আমরা চেষ্টা করতাম, গান যখন মোটামুটি ঠিক স্পিডে পৌঁছতো, তখন আঙ্গুলের চাপে ঐ স্পিড ধরে রাখতে। চাপ একটু এপাশ ওপাশ হলেই পাহাড়ীবাবু হয়ে যেতেন কখনো বা সায়গল, কখনো বা কমলা ঝরিয়া।

আচঁড় ঃ
ভাস্কর্য বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন শ্রীহরভূষণ মাল। খড়গপুরের ছেলে। একদিন দেখি ঠেলাগাড়িতে করে হরদা বিশাল একখ ানা গোলাকার পাথর গঙ্গার পাড় থেকে নিয়ে এলেন কলেজে। পাথরটিকে স্থাপন করা হলো কলেজের বাগানে। তারপর হরদা শু করলেন পাথরটার চারিদিক ঘুরে ঘুরে ছেনি হাতুড়ির ঠুকঠাক। ঐ মস্ত গোল পাথরটা দিয়ে উনি কি গড়বেন জ ানতে চাইলে মালবাবু কেবল মুচকি হাসেন। ছেনি হাতুড়ির ঠুকঠাক চলল প্রায় দুমাস। একদিন আবাক হয়ে আমরা আ বিষ্কার করলাম, পাথর থেকে বেরিয়ে এসেছে গাবদা গাবদা দুই পালোয়ান। কুস্তিকরছে দুজনে। গঙ্গার পাড়ে পড়ে থাকা পাথরখানা দেখে তার ভেতরে হরদা অনেক আগেই দেখে ফেলেছিলেন দুইপালোয়ানকে। আমাদের ভোঁতা চোখ যার দেখা পেলো অনেক পরে।
আমরা পথেঘাটে মাঠেময়দানে ছবি আঁকা অভ্যাস করে বেড়াতাম পাগলের মতন। একবার হস্টেলের ছাদে উঠে মস্ত একখানা ক্যানভাসে তেল রঙে একটা ছবি আঁকছি। মনে মনে বিষয় ঠিক করেছিলাম, কলকাতার কংক্রিটজঙ্গল। মধুদা ম াঝে মাঝেই এসে দাঁড়াতেন পেছনে। মধুদা তখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দেখতেন। কিছু বলতেন না। একদিন হঠাৎ আমার হাত থেকে ব্রাশখানা চেয়ে নিয়ে ছবির ছোট্ট একটুখানি জায়গা নিজের হাতের দু - একটা আঁচড়ে ঠিকঠাক করে দিলেন। ছবিখানা যখন কলেজে নিয়ে গিয়ে আমার শিক্ষক মহাশয়কে দেখালাম, তিনি সমস্ত ছবিটা এক ঝলক দেখে নিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে এই জায়গাটা কে করেছে বলতো? তুমি তো করনি মনে হচ্ছে। শিক্ষক মহাশয়ের তীক্ষ্ম চোখ এক লহমায় ধরে ফেলেছে অভিজ্ঞতার আঁচড়। যে আঁচড় আমার মনে আজও মলিন হয়ে য ায়নি।

কাজীসাহেব ঃ
ফণিবাবু আপত্তি করেননি মহারাজের নাম শুনে। ফণিবাবুর সূত্র ধরে আলাপ হয়েছিল অনেক গুণী ব্যক্তির সঙ্গে। এমন কি কেরামতুল্লা খানের সঙ্গেও। একদিন আলাপ হলো আকাশবাণীর শিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি হলেন স্বন ামধন্য কৌতুক অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। থাকতেন টালিগঞ্জেরই চা এভিনিউতে। একদিন ওদের বাড়িতে আমরা বসে গান বাজনা করছি, হঠাৎ নীলিমাদি বললেন, কাজীসাহেবের বাড়ি যাবি ? চোখে মস্ত একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ এঁকে আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম নীলিমাদির মুখের দিক। নিউ থিয়েটার্সে স্যুটিংএ যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে ভানুদা বেরোচ্ছিলেন। আমার ওরকম জিজ্ঞেসার চিহ্মার্কা চেহারা দেখে শরীর বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, পেলিকেনের মতো হাঁ করে আছিস কেন হতভাগা, কাজীসাহেবকে চিনিস না ? কাজী নজল ইসলাম। আমামীকাল ওনার জন্মদিন। অ ামরা সবাই যাবো। রবিও যাবে। কাজী সাহেবকে তোচিনিস না। রবিকে চিনিস তো? রবি ঘোষ। অনুভাও যাবে। কাল সক্ক াল সক্কাল চলে আয় ছোনো পাউডার মেখে। তোর নীলিমাদির গান হবে। তুই বাজবি সঙ্গে। এমন সুযোগ আর পাবি না

রে এ জন্মে !

পরদিন আমরা সবাই মিলে দুখানা অ্যামবাসাডরে বোঝাই হয়ে পৌঁছলাম কাজী নজল ইসলামের বাড়ি। উনি তখন পুত্র কাজী অনিদ্ধর সঙ্গে থাকতেন। ইতিমধ্যে বহু জ্ঞানী গুণী সিনেমা শিল্পী, থিয়েটার শিল্পী, গায়ক গায়িকা হাজির হয়েছে কাজী নজল ইসলামকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে। কাজীসাহেব ঘরের এক পাশে বসে রয়েছেন নতুন পোষাকে, তাঁর জন্য সজ্জিত অ াসনে। কপালে চন্দন, গলায় সাদা ফুলের মালা। পা দুখানি ঢেকে গিয়েছে ভক্তজনেদের দেওয়া ভালোবাসার ফুলে ফুলে। কবি কিন্তু নির্বিকার। আগুনের ভাঁটার মতন দুটি চোখ। এপাশ ওপাশঘোরাফেরা করছে। পুত্রবধূরা সামনে পুরনো খবরের কাগজ এগিয়ে দিচ্ছেন কাজীসাহেবের হাতে। তিনি সেগুলো ছিঁড়ে চলেছেন আপন মনে। মস্তিস্কে সামান্য যে অনুভূতিটুকু এখনও জীবিত আছে তাতে শুধু ঐ একটি কাজই তিনিএখন করতে পারেন। আর সব নিরাকার ব্রহ্ম। এতো অজস্র গানের রচয়িতা, সুরকার আজ স্তব্ধ। একটু পরে কাজী সব্যসাচী বিদ্রোহী কবিতাটি পাঠ করলেন বাবার পাশে দাঁ ড়িয়ে। আমি মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম কাজী নজল ইসলামের হাতের মুঠোয় ভাষা মাঝে মাঝে বদলে যাচ্ছে কবিতার কোনো কোনো শব্দের শক্তিতে। হয়তো সূক্ষ্মকোনো প্রাণ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে তাঁর মৃত মস্তিস্কে। নিয়তির কি নিঠুর পরিহাস! নীলিমাদি সেদিন গাইলেন গানগুলি মোর আহত পাখির সম, লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে প্রিয়তম।

সাপ ঃ

এতোদিনে নতুন অধ্যায় লেখা হয়ে গেছে বাংলা সিনেমার ইতিহাসের পাতায়। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী বিজয় করে ফেলেছে। আমাদের গোটা দল একদিন পথের পাঁচালী দেখে এলাম মুগ্ধ চোখে। শুনেছিলাম পথের পাঁচালীর বেশ কিছু শ্যুটিং হয়েছিল বোড়াল গ্রামে। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে একদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম বোড়াল গ্রাম দেখার জন্যে। সারা গ্রাম ঘুরে ঘুরে বুঝলাম না কিছুই। কোথা পুকুর, কোথায় কাশবন, কোথায়ট্রেন! ঐ কাঁচা বয়েসে কি জানতাম, কোথাকার কোন্ দৃশ্য কোথায় কি ভাবে জুড়ে ছবি তৈরি হয় ! একদিন হঠাৎসুযোগ এলোসত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আলাপ করার। আলাপের সূত্র ছিল একখানি পাইথন সাপ।

কোনো এক বার্ষিক প্রদর্শনীর সময় সুমন নামে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হাঁটা চলায় বনেদিআলোড়ন। ঠোঁ াটে অমায়িক হাসি। ক্যান্টিনে বসে চা খেতে খেতে সুমন তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি জ্যান্ত সাপ বার করে দেখাল। সাপ দেখে আমাদের সবার চোখ কপালে। সুমন বলল, এটা হলো বেবি পাইথন। অবিচল চিত্তে সাপটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে সুমন জানালো, বাড়িতে তার একটা ছোটো চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে এরকম আরও অনেক কিছু রয়েছে। একদিন আমি ওদের বাড়ি গেলাম ওর চিড়িয়াখানা দেখতে। ময়ুর, কাকাতুয়া, লরিস মাউস - ডিয়ার (ছোট জ াতের হরিণ) আরও অনেক কিছু ছিল ওর সখের চিড়িয়াখানায়। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল, মানিকমামার চিড়িয়াখানা সিনেমাতে ঐ পাইথন সাপটিই দেখানো হয়েছিল উত্তমকুমারের হাতে। মানিকমামার নাম শুনেই হৃদকম্প শু হলো আম ার। জানা গেল মানিকমামা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় সুমনের মামা। ব্যাস -- একদিন সুমনকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলাম সত্যজিৎবাবুর তিন নম্বর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে। তখন তিনি এখানেই থাকতেন। আলাপ হলো। পরিচয় হলো, শ্যুটিং দেখাও হলো। ঐ সময় তিনি ব্যস্ত ছিলেন গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবির কাজে। ব্যস্ত কাজের ফাঁকেও তিনি নানা কথ া বললেন এবং নানা কথা জানতে চাইলেন।

চন্দ্রমল্লিকা ঃ

আর্ট কলেজের পাঠ একদিন শেষ হলো। ফিরে এলাম নিজের শহরে। জিনিসপত্রে বোঝাই কণ্ঠে মহারাজের উপহার - দেওয়া তবলাখানা সঙ্গে করে আনা হলো না। ভেবেছিলাম পরে কখনো গিয়ে নিয়ে আসবো। আর যাওয়া হয়নি। মেঘে মেঘে বয়ে গেল অনেকগুলো বছর। জীবিকার স্রোতে বন্ধুরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়ল কে জানে ! অনেক ঠিকানা হারিয়ে গেল, অনেক নাম মুছে গেল, অনেক চেহারা আবছা হয়ে গেল, অনেক স্মৃতি তলিয়ে গেল। চোখে চশমা উঠলো, চুলে প াক ধরল অতিক্রান্ত হয়ে গেল জীবনের অনেকখানি পথ। চিঠির বাক্সে হঠাৎ একদিনএকখানা আমন্ত্রণপত্র পেলাম। চমকে উঠলাম। আর্ট কলেজে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ। কি ভাবে কে বা কারা ঠিকানা পেয়েছিল, জানি না। মনে মনে

হিসেব কষে দেখলাম, প্রায় চল্লিশটা বছর পেরিয়ে এসেছি। আর্ট কলেজের আকর্ষণ উপেক্ষা করা সম্ভব হলো না। গেলাম। উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক পুরনো বন্ধু - বান্ধবীদের সাথে দেখা হলো। কারো কারো চেহারা আমূল বদলে গেছে। আবার কেউ কেউ তেমন বদলায়নি। সময় এক একজনকে এক একরকম ভাবে সোহাগ জানায়। অঙ্কুরের কোনো সন্ধান পেলাম না। কেউ কিছুই বলতে পারলো না। নতুন যুগের উদ্যোগী ছাত্রছাত্রীরা অনেককেই আমন্ত্রণ করে ডেকে এনেছে। ভালো লাগালো ওদের আতিথেয়তা। দু - একজন সহপাঠীএখন এই কলেজেরই শিক্ষক শিক্ষিকা। প্রায় সকলেরই বিয়ে - শাদি, ছেলে - পুলে, নাতি - নাতনি হয়ে গেছে। কিছু অপঘাত, অঘটন, হার্ট অ্যাটাক, ডাইভোর্স, ক্যান্সার ইত্যাদির দুঃসংবাদও পেলাম। দু - একজন চিরকুমার চিরকুমারীদের সঙ্গেও দেখা হলো। জীবন এগিয়ে চলে তার নিজের হিসেবে, তবু মানুষ সারাজীবন হিসেব খুঁজে ফেরে।

অনুষ্ঠান একসময় শেষ হলো। পরদিন রবিবার। ইচ্ছে হলো ফেলে আসা হস্টেলটিতে একবার যাই। পরদিন সকাল সকাল বেরিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর পর পৌঁছালাম জোড়াসাঁকোর যদুলাল মল্লিক রোডে। পুরনো স্মৃতিতে চোখ মন সিক্ত হয়ে এলো। এই সেই মণিকাদির বাড়ি, যেখানে এক সময় মাছ ভাত খেয়ে নিয়ে রওনা হতাম কলেজের উদ্দেশ্যে। শুতে হস্টেলে মেস - সিস্টেম আরম্ভ হয়নি তখনও। মাণিকাদিরা আদর করে পিঁড়ি পেতে মাছ ভাত খাওয়াতেন মাত্র একটাকার বিনিময়ে। কিছু কিছু পরিবারের এটা ছিল অতিরিক্ত আয়ের সুস্থ সংস্থান। এখনও ওরকম বাড়ি আছে কিনা, জানি না। অনেক পরিজনহীন মানুষদের মাণিকাদির মতন দিদিরা মাত্র একটাকাতে পেটভরে খাইয়ে অতিরিক্ত দুটো - পয়সা সংসারের সাহায্য করতেন।

ঐ তো দিনুকাকার চায়ের দোকান! দোকানটা যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। দিনু কাকাকে দেখতে পেলাম না। ঐ সেই জগু মহান্তির লুচির দোকান। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে যেখানে খিদে মিটিয়ে নিতাম। একশো গ্রাম লুচির চার আনা, তরকারি ফ্রি । দোকান আগের চেয়ে সাজানো গোছানো। বৃদ্ধ জগু মহান্তি এখনও বসে। আমায় কি চিনতে পারবে? মল্লিকাদের রাজবাড়ির সারা গায়ে এখনও আগের মতোই অরক্ষণের চিহ্ন। বাগানে শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলো ধুলো মলিন। বিশাল বাগানটা ঝোপ - জঙ্গলে ভরা। কলকাতা কলকাতাতেই রয়ে গেছে। হস্টেল বাড়িটার কাছে এসে পৌঁছলাম একসময়। যদুলাল মল্লিক রোড এবং পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ছিল আমাদের হস্টেল বাড়িটি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রহীন উপন্যাসের সেই পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট। যেখানে থাকতো কিরণময়ী।

হস্টেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ। এতবছর পরেও কিছুই বদলায়নি চারতলা বাড়িটির। কোলাপ্সিবেল গেটখানা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। আগে একজন নেপালি দারোয়ান থাকতো। কাউকে দেখতে পেলাম নাআজ। সিঁড়ি বেয়ে এক পা এক পা করে উঠতে লাগলাম। কাঠের রেলিং দেওয়া সিঁড়ি। তাই ধরে ধরে উঠে এসে দাঁড়ালাম চারতলার কোণের দিকে আমার ঘরটির সামনে। যে ঘরটিতে প্রায় পাঁচ বছর কাটিয়েছি। উঠতে গিয়ে হাঁফ ধরে গেল। যখন ছাত্র ছিলাম, উঠে যেতাম এক দৌড়ে। দরজায় টোকা দিতে একটি ছেলে দরজা খুলে দাঁড়ালো। আমার পরিচয় পেয়ে ছেলেটি আপ্লুত। গতকালের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সেও ছিল। বললাম, এই ঘরটিতে আমি থাকতাম। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালো সে আমায়। আমায় চোখ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলো সারা ঘর। অনেক প্রাণের কথা হলো ছেলেটির সাথে। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ল। ছেলেটির নাম স্বরূপ। আমি একটু চায়ের ব্যবস্থা করি বলে স্বরূপ বেরিয়ে গেল ছুটে। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম ব্যালকনির দিকে। গ্রীষ্মের কত রাত্রি কাটিয়েছি এই ব্যালকনিতে শুয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল, কণ্ঠে মহারাজের উপহার দেওয়া খয়ের কাঠের সেই প্রকান্ড তবলাখানা ব্যালকনির এক কোণে রাখা আছে। চামড়া ফেটে গেছে। তাতে মাটি ভরে কেউ একখানি চন্দ্রমল্লিকার গাছ লাগিয়ে দিয়েছে। ফুলও ফুটেছে গাছটিতে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com